আলো হাতে মেলবোর্নে আনিসুল হক

নাহিদ খান, বাংলা সাহিত্য সংসদ, মেলবোর্ণ।

৪ নভেম্বর, ২০০৭। যখন নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে ঢাকায় মেতে ছিল 'প্রথম আলো' ঠিক তখন এক টুকরো আলো এসে পড়েছিল এই মেলবোর্ণেও। প্রথম আলোর অন্যতম প্রতিনিধি আনিসুল হক ছড়িয়ে দিলেন অনেক আলো মেলবোর্ণের প্রবাসী বাঙালীদের মাঝে।

বাংলা সাহিত্য সংসদ (বি এস এস) এর আমন্ত্রণে ২ নভেম্বর মেলবোর্নে এসেছেন আনিসুল হক। এইখানে বি এস এস এর সামান্য পরিচিতি প্রয়োজন। দুই বাংলার পাঁচটি করে সাহিত্য অনুরাগী মোট দশটি পরিবার ছ'বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই বি এস এস। এর কার্যক্রম হচ্ছে: ঘরোয়া সাহিত্য আলোচনা, সাহিত্য ভিত্তিক ছোট অনুষ্ঠান, বছরে একটি নাটক, ঢাকা বা কোলকাতা থেকে একজন বিশিষ্ট লেখকের সাথে কিছুক্ষণ এবং একটি বাৎসরিক ম্যাগাজিন প্রকাশনা, 'দখিনা প্রয়াস'। বিদেশে এ ধরনের ছোট ছোট সংগঠন হয়ত নতুন কিছু নয় তবে মেলবোর্নে এমন সংগঠন এটাই প্রথম। এ পর্যন্ত বি এস এস এর আমন্ত্রণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মকবুলা মনজুর, নবনীতা দেবসেন, সেলিনা হোসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং এবারে এলেন আনিসুল হক।

৪ নভেম্বর ছিল তাঁকে নিয়ে বি এস এস এর বিশেষ অনুষ্ঠান। এইদিনে প্রকাশিত হোল বাৎসরিক ম্যাগাজিন 'দখিনা প্রয়াস: মেলবোর্নে আনিসুল হক'। অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে বি এস এস পরিবেশন করল তাঁর বিভিন্ন রচনার অংশবিশেষ, তাঁর লেখা নাটকের ভিডিও ক্লিপিং এবং লেখক সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য। তারপরে রইল অনেক প্রত্যাশার 'লেখকের কাছে শোনা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। 'আনিসুল হকের সাথে কিছুক্ষণ' সন্ধ্যাটি হয়ে রইল অনেক দিনের জন্য দর্শক-শ্রোতার মাঝে এক স্মরণীয় সন্ধ্যার।

আনিসুল হক বলে গেলেন লেখক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। কিভাবে লিখতে শুরু করলেন, কেমন করে যুক্ত হ'লেন 'প্রথম আলো'র সাথে। বললেন লেখাতে কি আনন্দ। তাঁর বক্তব্যে এসেছে অনেক সুধীজনের নাম অকপটে, যাঁরা অনেক ভাল কাজ করেছেন এবং যাঁরা এখনো করে যাচ্ছেন। খুব কম গুণীজনকেই দেখা যায় অন্যের সুখ্যাতি করতে। কোন কারণে সতীর্থ লোকেদের নামগুলো থেকে যায় অব্যক্ত। কিন্তু আনিসুল হক ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করলেন প্রসঙ্গক্রমে অনেক বরেণ্য নাম আর অবদান। দুই বাংলার সকল দর্শক-শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন তাঁর কথা। অপূর্ব সহজ সরল সাবলীল ভাষা যা সবার মনকে ছুঁয়ে গেছে।

কবি হতে চেয়ে হলেন প্রকৌশলী, তারপরে হয়ে উঠলেন লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সাংবাদিক। সুন্দর গল্পোচ্ছলে তাঁর নিজের কথাগুলো ছিল বেশ উপভোগ্য। দর্শক-শ্রোতা হাসলেন প্রচুর। সাংবাদিকদের বিয়ের বাজারে খুব সম্ভাবনা নেই বলে হবু স্ত্রীর প্ররোচনায় বিসিএস দিয়ে সরকারী কাজে যোগ দিয়েছিলেন -- এমন সরল স্বীকারোক্তিতে না হেসে কি পারা যায়!

বর্ণনা করলেন 'মা' উপন্যাস লেখার প্রেক্ষাপট। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শ্রোতার মন। যেন আজাদের মায়ের কষ্টটা সবাই অনুভব করতে পারছে। কেউ যেন কোনদিন ভুলে না যায় কত দুর্দান্ত সহিষ্ণু মায়েদের ত্যাগে এসেছিল আমাদের স্বাধীনতা। মনে প্রশ্ন জাগে স্বপ্নের বাংলাদেশে এইসব মহিমান্বিত নারীদের কথা আর ক'জনে বলে!

সাম্প্রতিক কালের মাদক আসক্তি, দূরারোগ্য ক্যানসার রোগের অসহায়ত্ব যেমন করে তিনি নাটকে তুলে ধরেছেন তেমনি এসব প্রতিকারের ও সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন দর্শকের সামনে। জানিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি বড় ও সামর্থ্যবান মানুষের করণীয়। প্রবাসীরা এইসব নাটক কেউ কেউ দেখেছেন তবে অনেকেই দেখেননি। তাই বি এস এস এর ভিডিও ক্লিপিং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো বেছে নিয়েছিল। আর সেই সাথে ছিল 'মা' থেকে পড়া অংশ বিশেষ। সব মিলিয়ে একটি গুরু গম্ভীর পরিবেশকে হালকা করে দিতে আনিসুল হক বললেন, 'এটা কোন শোকসভা নয়'। মানুষের জীবনে দুঃখ-হতাশা আছে, আবার আশা-আনন্দ ও আছে। পৃথিবী আর জীবন আসলে খুব সুন্দর। এমন ভাবে বললেন যেন সত্যি সত্যি পৃথিবীটা সুন্দর আর আনন্দময় হয়ে উঠল।

বললেন অনেক আশার কথা। আমাদের দেশে এত মানুষ, এই-ই আমাদের সম্পদ। আমরা যদি এ সম্পদ সঠিক ভাবে কাজে

লাগাতে পারি তবে দুঃখকে আমরা জয় করবই একদিন। মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে নেই, মানুষ-ই পারে অসাধ্য সাধন করতে। এত আশার কথায় আনন্দে নিজের অজান্তে চোখের পাতা ভিজে উঠল। মনে পড়ে যায়, বাংলাদেশে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। একান্ত নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির কথা। আবেগাপ্লুত হতে হয় প্রিয় বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথায়। আনিসুল হক বলতে থাকলেন, খুব সকালে শত শত পোষাক শিল্পের কর্মীদের হেঁটে যেতে দেখলে মনে হয় এগিয়ে চলেছে স্বদেশ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে সব অন্যায়ের প্রতিকার। মানুষ দৃঢ় চিত্তে চাইলে হতে পারে স্বাধীনতা বিরোধীর সঠিক বিচার। যেখানে অন্ধকার সেখানেই ধর্মান্ধতা, অরাজকতা, নাশকতা; তাই প্রয়োজন একটু একটু করে সুশিক্ষার আলো। সেই সাথে বললেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষকে করে মননশীল, জন্ম দেয় পরীশিলীত প্রাণ, উৎকর্ষ হয় জীবন -- সেখানেই পৃথিবীর সৌন্দর্য। যারা যুদ্ধের মত দানবীয় ঘটনা ঘটায় তাঁর মতে তাদের কখনো সঠিক সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ হয়নি। যে গল্প-কবিতা-গান ভালবাসে সে নিরীহ মানুষের ওপর ক্লাস্টার বোমা ছড়াতে পারে না, ছুঁড়তে পারে না মিসাইল সভ্যতার ঐতিহ্যে।

দর্শক-শ্রোতার সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল বেশ প্রাণবন্ত। কথা উঠেছিল ভাষার বিভিন্নতা নিয়ে। তিনি খুব সহজ ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন কেন নাটকের সংলাপ হবে মানুষের মুখের ভাষা। তা না হলে নাটক কখনো মানুষের কাছাকাছি যেতে পারে না। বইএর ভাষাকে সাধারণ মানুষের মুখে তুলে দিলে কিছুটা শ্রুতিমাধুর্য্য আসলেও সেখানে থাকে প্রাণের অভাব। আরো বললেন দু'একটি বিদেশী ভাষা বাংলাতে ঢুকে গেলে তেমন বিশেষ ক্ষতি তো নেই-ই বরং বাংলা ভাষা আরো সমৃদ্ধ হতে পারে। মনে করিয়ে দিলেন অন্য ভাষার এই অনুপ্রবেশ কোন নতুন ঘটনা নয় যে এটা নিয়ে বিরাট হৈ চৈ করবার প্রয়োজন আছে। চিরকাল সব ভাষার-ই নানাবিধ সংস্কার হয়ে আসছে এবং কোন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা রোধ করা যাবে না। ভাষার মান সংরক্ষনে সাহিত্যিকদের ভূমিকাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। সুতরাং তাঁর নাটকে আটপৌরে ভাষার ব্যবহার থাকলেও গল্প, উপন্যাসে তিনি সে ভাষার স্থান দেননি।

বি এস এস সদস্যবৃন্দ যখন সব আয়োজনের মান নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি তখন করলেন সবকিছুর ভূয়সী প্রশংসা। যে 'পাঠকের দৃষ্টিতে লেখক' সম্পর্কে মন্তব্য পড়ল তাকে বিনয়ের সাথে বললেন, 'বানিয়ে বানিয়ে লিখলেন কেন এতসব কথা?' নিজের ঢাক তো সারাক্ষণ বন্ধ করেই রাখলেন, অন্যকেও দিতে চান না বাজাতে। কেবলই বলেন যা কিছু সৃষ্টি তিনি করেছেন তা তেমন বড় কিছু নয়। নাটক? সে তো পরিচালকের গুনে এত ভাল হয়! সংবাদপত্রে লেখা? সে তো সম্পাদকের উৎসাহে এত প্রচার পায়! বক্তৃতা? সে তো বড় মানুষদের কথার উদ্ধৃতিতে এত ভালবাসা পায়! আমরা সবাই জানি 'বৃক্ষ তার ফলভারে একটু নুয়েই থাকে'। তাঁর জন্য আয়োজিত নাটকের কলাকুশলীদের জানালেন আন্তরিক অভিনন্দন। 'দখিনা প্রয়াস' হাতে নিয়ে দেখেশুনে বললেন এর অলংকরণ আর কম্পোজিশন দেখে মনে হয় না যে এ ম্যাগাজিন বছরে মাত্র একবার প্রকাশিত হয়! অন্যকে বড় বলতে তিনি এতটুকু কার্পণ্য করেননি। নিজে অনেক বড় না হলে কেউ কি কখনো এতটা উদার হতে পারে? বি এস এস কে বললেন একটি অনন্য সংগঠন যা দুই বাংলার মানুষের একসাথে কাজ করার জন্য আর শুধুমাত্র সাহিত্য ভিত্তিক। তিনি বলেছিলেন অভিনেতা, গায়ক, নৃত্যশিল্পীদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যিক নিয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়াস আজকের পৃথিবীতে বিরল। তাঁর এ স্বীকৃতি বি এস এস এর জন্য হয়ে রইল প্রচন্ড উৎসাহব্যন্জক।

আনিসুল হকের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের আয়োজক হিসাবে বি এস এস এর সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক ভাবেই ছিল একটু বেশী সৌভাগ্যবান। অর্থাৎ ৪ নভেম্বর এর সান্ধ্য অনুষ্ঠান ছাড়াও তাঁরা পেয়েছে লেখকের সান্নিধ্য একটু বেশী। সুযোগ হয়েছিল লেখকের সাথে বিভিন্ন জায়গায় কিছু সময় কাটানোর। সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল একেকটি দিন, নিয়ে গিয়েছিল আনিসুল হককে কিছু আকর্ষণীয় স্থান দেখাতে। এত অল্পদিনে সে প্রচেষ্টা হয়ত ততটা ফলপ্রসু হয়নি তবে বি এস এস এর জন্য দিনগুলো ছিল বড় আনন্দময়। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের এ সময়টা বি এস এস এর জন্য এক পার্বণের মত। সাহিত্যিকদের নিয়ে ক'টা দিন খুব হৈ চৈ করে বড্ড তাড়াতাড়ি ফুড়িয়ে যায়। এ বছরের পার্বণ ছিল সামগ্রিক ভাবে অনাবিল আনন্দের। তা শুধু আনিসুল হকের মত প্রাণবন্ত মানুষের উপস্থিতিতে।

মেলবার্ণ মিউজিয়ামে যেদিন তিনি গেলেন সেদিন বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলের দশ পনেরটি দল ও এসেছিল। চারদিকে কিচির মিচির শব্দে কান ঝালাপালা এবং প্রতিটি শোরুমে দুষ্টুগুলোর ভীড়ে কাছ থেকে কিছু দেখাই ছিল দুরূহ ব্যাপার। আনিসুল হক সেই ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দারুন মমতাভরে বললেন, 'বাচ্চাদের দেখতেই ভাল লাগে'। বিশ্বের সব শিশুদের জন্য রয়েছে তাঁর গভীর ভালবাসা। এক পর্যায় স্বীকার করেছিলেন নিজের মেয়ে জন্মাবার পর এ অনুভূতি বেড়ে উঠেছে আরো বেশী করে মনের গহীনে। ঢাকার বিশাল জনস্রোতের যানজটে স্কুটার থেকে কোন শিশুর পা বেরিয়ে থাকতে দেখলে তাঁর মন অজানা আতংকে কেঁপে উঠে। 'আর একটু কি সাবধান হতে পারে না বাবা-মা'?

সবার সাথে আন্তরিক ভাবে গল্প করা আনিসুল হকের সহজাত স্বভাব। মনে করিয়ে দিলেন বড় লেখকরা মানুষ ও বটে! দৈনন্দিন

জীবনযাত্রা আর দশটা মানুষের মতই সাধারণ। তাই সবাই তাঁকে আপন করে নিয়েছিল অত্যন্ত সাচ্ছ্যন্দের সাথে। তিনি যেন নিজের কেউ, খুব কাছের মানুষ। শুধু মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে সে আলো যা শত বিনয়েও ঢেকে রাখা যায় না। ঘুরতে ঘুরতে একবার বিরাট অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিশাল মহাদেশের মাঝখানটায় বিস্তৃত প্রান্তর জনশূন্য দেখে গাঢ় স্বরে বললেন, 'মঙ্গাপীড়িত কিছু লোককে এখানে জায়গা দেয়া যায় না'? এমন সহজ সরল প্রশ্নের যদি একটা সহজ উত্তর থাকত? বাংলাদেশে আরও কিছু এমন আনিসুল হক থাকলে 'এ দেশটার কিছু হবে না'-- এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তিনি বেঁচে থাকুন আরও একশ বছর। তাঁর হৃদয়ের আলো ছড়িয়ে যাক আরও হাজার বছর।

৯ নভেম্বর সকাল এগারোটায় আনিসুল হক তাঁর আলোর ভান্ডার নিয়ে চলে গেলেন সিডনী। অবিস্মরণীয় কিছু স্মৃতি পড়ে রইল পেছনে, মেলবোর্ণে। তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন প্রবাসী বাঙালীর মন।